দার্জিলিং পাহাড় ঃ সমস্যার মূলে যেতে হবে

দার্জিলিং এখন প্রবলভাবে অগ্নিগর্ভ। পুলিশ, সেনা বাহিনী, আধা সেনার ভারি বুটের দাপটে তটস্থ পাহাড়। তছনছ শান্ত, নিরীহ পাহাড়বাসীর জীবন। পুলিশের গুলিতে আটজন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। আহত বহুজন। গোর্খাল্যান্ডের জন্য গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার 'অন্তিম লড়াইয়ের' ডাকে প্রায় দুই মাস চলেছে একটানা বনধ, পুড়েছে সরকারি গাড়ি, অফিস। মোর্চা নেতারা মুখরক্ষার জন্য এখন কেন্দ্র রাজ্যের দরবারে আলোচনার ডাক পাবার আর্জি জানিয়ে চলেছেন। এদিকে দীর্ঘ বনধের ফলে সাধারণ মানুষের ঘরে খাবার নেই, রুজি রোজগার বন্ধ। ভরা কাজের মরশুমে স্তব্ধ চা বাগান। জিটিএ বা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পদ থেকে মোর্চার সদস্যরা পদত্যাগ করেছেন। অথচ গণ্ডগোল শুরু হওয়ার সামান্য আগেও, পরিস্থিতি যে এতটা অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে তা পাহাড়ে বারবার যাওয়া মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পুলিশের গোয়েন্দারা আঁচই করতে পারেননি।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য সরকারে আসীন হওয়ার পর তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বিমল গুরুঙ্গের নেতৃত্বে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) গঠিত হয়। চুক্তি সম্পাদন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, পাহাড় হাসছে। সে সময় আমরা বলেছিলাম, "পূর্বের গোর্খা হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের মতো এই পুনর্বিন্যস্ত প্রশাসনিক মডেল দার্জিলিঙের নিপীড়িত মানুষের জীবনে কোনও স্বস্তির ছোঁয়া আনবে না। পরিবর্তে তা আবারও জন্ম দেবে দার্জিলিঙের জনগণের মধ্য থেকেই এক অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত বিত্তবান গোষ্ঠীর, যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী আঞ্চলিক বুর্জোয়া এবং ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবে। যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জনগণকে আরও শোষণ করা, শ্রমজীবী জনগণের পরিশ্রমে সৃষ্ট সম্পদ লুট করা এবং এভাবেই ফুলে-ফেঁপে ওঠা।" (গণদাবী, ৬৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা,২৬ আগাস্ট-১ সেপ্টেম্বর, ২০১১)। এবারের ঘটনা আমাদের বিশ্লেষণকেই সত্য প্রমাণ করেছে।

পাহাড়ের জনগণের মূল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেনি সরকার বা জিএনএলএফ, জিজেএম কেউই

একথা ঠিক বিগত কংগ্রেস বা সিপিএম সরকারের মতোই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দার্জিলিংয়ের শোষিত গরিব মানুষের কোনও একটি সমস্যারও সুষ্ঠু সমাধান করেনি। পাহাড়ের অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও বনজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প স্থাপন, চা বাগান শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়ার সমাধান, কমলালেবু ও অন্যান্য ফল বাগিচা শ্রমিকদের শোষণ বন্ধ করা, ফড়ে-দালাল-বৃহৎ পুঁজি মালিকের যোগসাজশে সাধারণ ফল উৎপাদকদের শোষণ বন্ধ করার লক্ষ্যে কোনও উদ্যোগ তৃণমূল সরকার নেয়নি। দার্জিলিং জেলায় কৃষির উন্নতির পরিকাঠামো গড়ে তোলার কোনও পরিকল্পনাই করেনি। পর্যটন ব্যবসা ক্রমাগত বৃহৎ পুঁজির কুক্ষিগত হচ্ছে, তাতে এখন নানা ধরনের ট্রেনিং প্রাপ্ত পেশাদারদের ভিড়। ফলে পর্যটন ব্যবসায় কিছু ড্রাইভারি এবং হোটেলের বেয়ারা বা মালবাহকের কাজ ছাড়া অন্য কাজে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ক্রমাগত কমছে। এলাকার মানুষের জীবনধারণের মতো যথেষ্ট রোজগার সুনিশ্চিত করা, পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটানোর মতো পরিকল্পনা দূরে থাক উল্টে সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশনকে ভিত্তি করে ওষুধ তৈরির মতো প্রাচীন শিল্প সহ বহু কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। কালিম্পঙের বিখ্যাত ডেয়ারির মতো অনেক কিছুই হয় আজ বন্ধ না হয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

দার্জিলিঙের মানুষ আগের মতোই দেখছেন পাহাড়ে রমরমিয়ে চলছে উচ্চবিত্ত ঘরের ছাত্রদের জন্য নামকরা সমস্ত বেসরকারি বোর্ডিং স্কুলের ব্যবসা। যেখানে পাহাড়ের সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীদের ঠাঁই পাওয়ার উপায় নেই। অন্য দিকে সাধারণ সরকারি স্কুলগুলি দেশের অন্যান্য জায়গার মতোই ধুঁকছে। আজও দার্জিলিঙের মানুষকে সাধারণ অপারেশন কিংবা সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্য বহু অর্থ ও সময় খরচ করে ছুটতে হয় সমতলের হাসপাতালে। পাহাড়বাসীদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সরকারি দফতরগুলির অধিকাংশই আজও সমতলেই অবস্থিত। পাহাড়ে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা বৃদ্ধি দূরে থাক বেশির ভাগ এলাকাতেই প্রাণ হাতে

করে ট্রেকারের ছাদে বা নানা কসরৎ করে ঝুলে ঝুলে যাতায়াতই যেন পাহাড়বাসীর ভবিতব্য! ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতেও বহুদিন পর্যন্ত দার্জিলিং-হিমালয়ান রেল নিছক টয়-ট্রেন ছিল না। হাজার হাজার যাত্রী পরিবহণের পাশাপাশি এই রেলপথে দার্জিলিংঙের পণ্য পরিবহণ চলত খুবই সস্তায়। এখন হেরিটেজের দোহাই পেড়ে এই রেলপথ কেবলমাত্র কিছু বিত্তবানের বিনোদনের বিষয় হয়েছে। চলেও খুব সামান্য পথ। অথচ উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সড়ক পরিবহণের বদলে রেলপথে অনেক ভাল এবং সস্তা পরিবহণের কাঠামো সরকার গড়ে দিতে পারত। এমন হাজারো সমস্যার সমাধান যেমন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার করেনি, তেমনই পাহাড়ের মানুষের আহত আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের ত্রাতা সাজা অতীতের জিএনএলএফ বা হালের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ডিজিসিএ এবং জিটিএতে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে এই কাজগুলির যতটুকু করতে পারত তার কিছুই করেনি। দার্জিলিং থেকে জেতা বিজেপির সাংসদদের কানেও এই এলাকার মানুষের কান্না পৌঁছতে পারেনি।

এই চূড়ান্ত বঞ্চনা দীর্ঘ সময় ধরে দার্জিলিংঙের পার্বত্য অঞ্চলের নানা গোষ্ঠীর মানুষের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অসন্তোষকে কাজে লাগিয়েই স্বার্থান্বেষী মহল তুলেছে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি। একথা ঠিক দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকার গোর্খা, লেপচা, ভুটিয়া, তামাং ইত্যাদি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সমতল এলাকার মানুষের ভাষাগত, সংস্কৃতিগত পার্থক্য আছে। কিন্তু এই পার্থক্য আছে বলেই এক একটা এলাকা নিয়ে অসংখ্য রাজ্য গঠন করলেই কি মানুষের মূল সমস্যাগুলির সমাধান হবে?

নেপালি-বাঙালি নির্বিশেষে বুর্জোয়া শোষণ-শাসনের শিকার

পূর্বতন জিএনএলএফ নেতা সুভাষ ঘিসিঙ থেকে বর্তমান গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুঙ্গ কেউই দার্জিলিঙের মানুষের দারিদ্র, বেকারি, চা বাগান শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি না পাওয়া ইত্যাদি মূল সমস্যাগুলির সমাধানে কী ভাবছেন, তা নিয়ে কোনও কর্মসূচি তাঁদের কাছ থেকে শোনা যায়নি। তাঁরা গোর্খা জনগোষ্ঠীর মানুষের সকলের স্বার্থ এক বলছেন, অথচ পাহাড়ের যে বিভিন্ন দলগুলি গোর্খাল্যান্ড চাইছে তাদের মধ্যেই ঐক্য কোথায়? দেখা যাচ্ছে নানা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে আন্দোলনের নেতৃত্ব বিভক্ত। এ শুধু এখন নয়, ১৯৮৬ সালের আন্দোলনের সময়েও এই পরস্পর দ্বন্দ্ব প্রকটভাবে সামনে এসেছে। বারবার পাহাড়ের সাধারণ মানুষ যে নেতাদের কথায় প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা একদিকে নিজেদের গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে ক্ষমতালাভের জন্য ব্যস্ত থেকেছেন, অন্য দিকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সাথে বোঝাপড়ায় নিজেরা রাজা-উজির হয়েছেন। পাহাড়ের সরকারি সব কাজের কন্ট্রাক্টরির বরাত এই সব নেতারা বা তাদের লোকেরাই পেয়ে এসেছেন। সাধারণ মানুষ বঞ্চিতই থেকে গেছেন। বর্তমান বিমল গুরুঙ্গ নেতৃত্বের উদ্ভবও হয়েছে গোর্খা নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের জেরে। গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু করে দু'বছর ধরে চলা আন্দোলনে পুলিশের লাঠি-গুলিতে প্রায় ১২০০ মানুষের প্রাণ যায়। শেষপর্যন্ত ১৯৮৮ সালে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) নামে এক আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা স্থাপনের দাবি মেনে নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার পাহাড়ের পৃথকতাবাদী নেতাদের সন্তুষ্ট করে। কিন্তু ২০০৪ সালে রাজ্যের সিপিএম নেতৃত্বাধীন সরকার সুভাষ ঘিসিঙের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ডিজিএইচসি-র নির্বাচন না করে তাঁকেই প্রধান প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করে দেওয়ায় অন্য কাউন্সিলরদের গুরুত্ব কমে যায়। ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জিএনএলএফ নেতা সুভাষ ঘিসিঙের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে জিএনএলএফ-এরই কাউন্সিলর বিমল গুরুঙ্গ বিরোধী আওয়াজ তোলেন। এই গুরুঙ্গ এবং তাঁর গোষ্ঠী পাহাড়ের অন্যতম নেতা মদন তামাং হত্যায় অভিযুক্ত। কোথায় জনগোষ্ঠীগত ঐক্য!

দার্জিলিং সহ সারা ভারতেই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ জীবন যন্ত্রণার কারণ নির্মম পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা। যে কোনও ভাষাগোষ্ঠী, জাত-ধর্ম-বর্ণগত সকল সম্প্রদায় নির্বিশেষে পুঁজিবাদী শোষণের নিয়ম এক এবং অভিন্ন। একই ভাষাগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় বা উচ্চ-নীচ বর্ণভুক্ত পুঁজিপতির সাথে সেই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীভুক্ত মজুর কৃষকের সম্পর্ক শোষক-শোষিত ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে না। দার্জিলিঙের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই। পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালে নেপালিভাষী পুঁজিপতিদের দ্বারা নেপালিভাষী শ্রমিক, কৃষক, খেত মজুররা অন্য যে কোনও ভাষাভাষী মজুর কৃষকদের মতোই চরম শোষিত হয়ে চলেছেন। এ দেশের হিন্দিভাষী বা গুজরাটি কিংবা বাঙালি মজুর কি তাদের একই ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত মালিকের কাছে কম শোষিত হয়? শ্রেণিবিভক্ত সমাজে একই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সকলের স্বার্থ কখনও এক

হতে পারে না। তার মধ্যেও আছে শ্রেণি বিভাজন অর্থাৎ শোষক এবং শোষিতের বিভাজন। যারা ভাষাগোষ্ঠী বা অন্য কোনও গোষ্ঠীগত একতার নাম করে শোষক-শোষিতের স্বার্থকে এক করে ফেলে, তারা কখনওই শোষিত মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। আমাদের মতো বহু ধর্ম এবং বহু ভাষাভাষী পুঁজিবাদী দেশে বৃহৎ জাতি গোষ্ঠীর দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতি গোষ্ঠীর উপর আধিপত্য, বৈষম্যমূলক আচরণ, অবহেলা, অবিচার ইত্যাদি আছে। কিন্তু তার থেকে মুক্তির উপায় কী?

বিভাজন শোষিত শ্রেণির মুক্তি সংগ্রামকে দুর্বল করে

একদল বলছেন অনুন্নয়ন নয়, দার্জিলিঙের মানুষের প্রধান সমস্যা তাঁদের আত্মপরিচয়ের সংকট বা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। ভেবে দেখা দরকার এই সংকট সৃষ্টি হল কেন? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এই তীব্র বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হয়েছে এ দেশের পুঁজিবাদী শাসকদের চরম বঞ্চনা, অবহেলা থেকেই। রাষ্ট্রের যে বঞ্চনা, অবহেলার শিকার তাঁরা, তার কারণও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মুনাফা লালসা। আইডেন্টিটি মানে কি নিজস্ব গোষ্ঠীভুক্ত কিছু আমলা বা একই ভাষাভাষী বুর্জোয়াদের দ্বারা শোষিত হওয়া! শাসকদের সাথে ভাষাগত, গোষ্ঠীগত মিল থাকলেই কি শোষণ বঞ্চনার অবসান হয়? ভাষা-সংস্কৃতির উন্নতি ঘটে? তাহলে নেপালের দরিদ্র জনগণকে নেপালি শাসকদের বিরুদ্ধে লড়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হল কেন? বাংলাভাষী মানুষকে বারে বারে রক্ত ঝরিয়ে রাজ্য সরকারের থেকে ন্যূনতম দাবি আদায় করতে হয় কেন? আজকের বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভাষা বা গোষ্ঠীগত মিলের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান কোথায় তা। তাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে মানুষে মানুষে সম্পর্ক। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটাও এই নিরিখে বিচার করতে হবে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব মূলত ছিল আপসকামী গান্ধীবাদীদের হাতে। তাঁরা ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে নিজেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীগত মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবিভেদকে দূর করার জন্য উপযুক্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলেননি। যার ফলে তুলনামূলক অগ্রসর উপজাতিদের (ন্যাশনালিটি) মধ্যে বৃহৎ উপজাতিগত দম্ভ গড়ে ওঠে। এর ফলে সমাজের দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর মানুষ বিশেষত পার্বত্য উপজাতিদের কিছুটা খাটো করে দেখা এবং তাদের উপর আধিপত্য কায়েমের মানসিকতা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভাবশালী উপজাতির মধ্যে তৈরি হয়। এর সাথে ব্রিটিশ সরকারের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি যুক্ত হয়ে অনগ্রসর নানা উপজাতি এবং পার্বত্য এলাকার শোষিত মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোতে টেনে আনা যায়নি। স্বাধীনতার পরেও মূলত প্রভাবশালী উপজাতির বুর্জোয়াদের হাতেই শাসনভার থেকেছে। তাদের আধিপত্যবাদী মানসিকতা এবং নির্মম শোষণের ফলে পিছিয়ে পড়া মানুষের বেশিরভাগ অংশ এবং পার্বত্য জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বোধ ক্রমাগত বেড়েছে। এদেশের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির শাসনে চলা চরম বঞ্চনার জন্যই দার্জিলিঙের নেপালিভাষী সহ নানা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের ভাষা এবং সংস্কৃতিগত বিকাশের অবাধ সুযোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। যে 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে'র কথা উঠছে তা আসলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ইত্যাদি সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার সংকট। বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনৈতিক দলগুলি যারাই নানা সময় কেন্দ্রে বা রাজ্যে সরকারি ক্ষমতায় থেকেছে তারা সকলেই এই বিচ্ছিন্নতা বোধ এবং দুর্বলতর গোষ্ঠীর মানুষের আত্মপরিচয় হারানোর আশঙ্কাকে কাজে লাগিয়ে সঙ্কীর্ণ ভোটের রাজনীতি করেছে। কিন্তু তাদের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করেনি। অন্য দিকে সমগ্র রাজ্যের স্বার্থরক্ষার চ্যাম্পিয়ান সেজে পাহাড়ের মানুষের যে কোনও ন্যায্য দাবিকেই গায়ের জোরে দমন করেছে।

শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য দুর্বল করা এবং গণআন্দোলনগুলিকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য শাসক পুঁজিপতিশ্রেণি পৃথকতাবাদকে উস্কানি দেয়। এ তাদের এক ধূর্ত কৌশল। এর ফলে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভাজন ক্রমাগত চলতেই থাকে। বৃহৎ ভাষিকগোষ্ঠী বা বৃহৎ জাতিসত্তার আধিপত্য যেমন মারাত্মক ক্ষতিকর তেমনই এর ফলে যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত মানসিকতা জন্ম নেয়, তা মেহনতি মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে তাদের সর্বনাশ করে। একসময় আসামে অসমিয়া সেন্টিমেন্ট তুলে সে রাজ্যের অন্যান্য ভাষিকগোষ্ঠীর জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা হয়েছে। আবার তার পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য গঠনের আন্দোলনের ফলে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় গড়ে উঠেছে। এর ফল কী

হয়েছে? এই রাজ্যগুলির মধ্যেও আবার নানা গোষ্ঠীগত মানসিকতাকে ভিত্তি করে নানা রকম পৃথকতাবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে। আসামের মধ্যেও অসংখ্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠেছে। এই নিয়ে লড়াইয়ে গোটা উত্তরপূর্বাঞ্চল একদিনের জন্যও শান্তি পাচ্ছে না। দার্জিলিঙের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। জিটিএ গঠিত হওয়ার পরপরই লেপচা, তামাঙ, ভুটিয়া ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে স্বশাসনের দাবি উঠছে। ডুয়ার্সেও আলাদা স্বশাসনের দাবি তোলা হয়েছে। এর শেষ কোথায়? আদিবাসী বা নানা অঞ্চলিক সেন্টিমেন্ট তুলে গঠিত ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড, তেলেঙ্গানা রাজ্যগঠন কি সেখানকার জনগণের দুর্দশা এতটুকু লাঘব করেছে? বিপরীতে এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে জনগণের উচ্চবিত্ত অংশের মধ্য থেকেই একটা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় জনগণের নতুন প্রভু হিসাবে মাথা তুলেছে। এরা দেশের পুঁজিবাদী শাসকদের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর জনগণকেই শোষণের শৃঙ্খলে বাঁধছে এবং যাবতীয় সুযোগ সুবিধা নিজেরা গুছিয়ে নিচ্ছে। একথা ক্রমাগত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, নতুন রাজ্য গঠন বা রাজ্য ভাগের দাবি কিংবা নানা গোষ্ঠীর জন্য আঞ্চলিক স্বশাসিত কাউন্সিল গঠনের দাবি একটি অন্তঃসারশূন্য প্রতারণাময় স্লোগান ছাড়া কিছু নয়। আসলে এই স্লোগান তুলছে শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষী আঞ্চলিক বুর্জোয়ারা, যাতে তারা সংশ্লিষ্ট এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে পারে এবং জনজীবনের জ্বলন্ত দাবিগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।

ভোটের স্বার্থে বুর্জোয়া দলগুলির সুবিধাবাদী রাজনীতি

বুর্জোয়াদের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা কী? একসময় কংগ্রেস দার্জিলিঙে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জিতেছে। ১৯৮৬-র গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময়েও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পাহাড়ের মানুষের বন্ধু সেজে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কংগ্রেসের উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, তেলেঙ্গানা ইত্যাদি নতুন রাজ্যগঠনের নীতিই নতুন করে গোর্খাল্যান্ড বোড়োল্যান্ড ইত্যাদি দাবিকে উস্কে দিয়েছে। বিজেপি তো সরাসরি গোর্খাল্যান্ড করে দেবে বলেই এমপি সিটে নিজেদের প্রার্থীকে জিতিয়েছে। কিন্তু এই বুর্জোয়া দলগুলির কাছ থেকে দার্জিলিঙের মানুষ কিছুই পায়নি। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে নিয়ে দার্জিলিঙের মানুষকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সেখানকার সাধারণ শ্রমজীবী, চা শ্রমিক, কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ বা অন্যান্য অংশের খেটেখাওয়া মানুষের উপর একসময় অবিভক্ত সিপিআই এবং পরবর্তীকালে সিপিএমের প্রভাব ছিল। কিন্তু তারাও বৃহত্তর বামপন্থী আন্দোলনের সাথে বিভিন্ন উপজাতীয় মানসিকতা ও দ্বন্দ্বের থেকে মুক্ত করার সংগ্রামকে যুক্ত করেনি। শোষণমুক্তির লড়াইয়ে এই মানুষগুলিকে টেনে আনার বদলে তারাও সহজ রাস্তায় সমর্থন পেতে গোর্খাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতেই আটকে ছিলেন। তাঁদের এমএলএ রতনলাল ব্রাহ্মণ এবং সাংসদ আনন্দ পাঠক এই দাবিই তুলেছেন। অথচ সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকাকালীন একদিকে গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে লাঠি-গুলি দিয়ে দমাতে চেয়েছে, অন্যদিকে 'বাংলা ভাগ হতে দেব না' স্লোগান তুলে সমতলের গরিষ্ঠ জনসমর্থন পকেটে পুরেছে। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের বিরোধিতার নামে এমনকী সমতল এলাকায় পাহাড়ের মানুষকে আক্রমণ করার মতো পরিবেশ তৈরি করতেও তাদের আটকায়নি। তৃণমূল ক্ষমতায় এসে প্রথমে পাহাড়ের কিছু সুযোগসন্ধানী নেতাকে ক্ষমতা পাইয়ে দিয়ে সমস্যাকে ধামচাপা দিয়ে তাকেই সাফল্য বলে প্রচার করেছে। একই সাথে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বোর্ড তৈরির নামে পাহাড়ে বিভাজন আরও বাড়িয়েছে। ক্ষমতার বৃত্তে আসতে চাওয়া কিছু মধুলোভী লোককে টাকা এবং ক্ষমতার প্রলোভন দিয়ে পুরসভা নির্বাচনে সাফল্যও তারা পেয়েছিল। এইভাবে তৃণমূল পাহাড়ে নিজেদের দলগত ক্ষমতাবৃদ্ধি ও বিমল গুরঙ্গ দের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু বৃহৎ গোষ্ঠীগত দম্ভকে চরিতার্থ করতে গিয়ে পাহাড়ের ছাত্রদের বাংলা পড়তেই হবে, এই কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়া বিমল গুরুঙ্গদের সুবিধা করে দিয়েছেন।

ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা সমস্যাকে জটিল করবে

যারা এমনিতেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন-অবহেলিত-অবদমিত মনে করছে, তাদের ক্ষেত্রে ভাষার মতো একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনার পরেই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। কিন্তু সরকার সে সবের ধার ধারেনি। পরে বাংলা আবশ্যিক নয় ঐচ্ছিক বললেও তা মানুষের গেঁথে যাওয়া গভীর অবিশ্বাসকে টলাতে পারেনি। দার্জিলিঙের স্কুলে বাংলা পড়ানো হবে কি না, হলে কীভাবে এবং কোন স্তর থেকে তা পড়াতে

হবে, এসব নিয়ে পাহাড়ের মানুষ তো দূরে থাক শিক্ষক-শিক্ষাবিদদের সাথেও সরকার কোনও আলোচনা করেছে কি? দার্জিলিংয়ের একজন ছাত্রকে স্কুলে নেপালি, ইংরেজি, হিন্দি এবং বাংলা এই চারটি ভাষা পড়তে হলে তাদের উপর যে চাপ বাড়বে দরিদ্র পাহাড়ি জনগণের ঘরের বহু ছাত্রেরই এর ফলে পড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সরকার এব্যাপারে কোনও চিন্তা করেছে কি? এর কোনওটির উত্তর সরকারের কাছে নেই। দার্জিলিঙের মানুষ পর্যটকদের সাথে কথাবার্তা চালানো, সমতলে নানা কাজে আদানপ্রদানের প্রয়োজনে এমনিতেই কিছুটা বাংলা শেখে, তা কাউকে চাপিয়ে দিতে হয় না। যে কোনও রাজ্যেই অর্থনৈতিক এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনে সেখানে বাস করা অন্য ভাষাভাষী অধিকাংশ মানুষ সেই রাজ্যের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষাটি শিখে নেয়। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী আঞ্চলিক বুর্জোয়ারা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থে পৃথকতাবাদী সেন্টিমেন্ট তৈরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও মেহনতি মানুষের ঐক্যকে নষ্ট করার জন্য কোনও একটি ভাষার প্রবল দরদি সাজে। একইভাবে এদেশের বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী কংগ্রেস এবং বিজেপি সর্বভারতীয় স্তরে হিন্দিকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে বারবার। তাতে হিন্দি ভাষার কোনও উপকার হওয়া দূরে থাক, হিন্দিকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে অন্য ভাষাভাষী বহু রাজ্যেই প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তার আবার সুযোগ নিয়েছে নানা পৃথকতাবাদী গোষ্ঠী। নেপালিভাষী, সাঁওতালিভাষী জনগণের উপর বাংলাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে গেলে এমন প্রতিক্রিয়াই ঘটবে। যার সুযোগ নেবে সুযোগসন্ধানীরা। যা ঘটেছে দার্জিলিঙে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং মাতৃভাষার যথাযথ চর্চার গুরুত্ব যেমন সর্বাধিক, তেমনই তার পাশাপাশি উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গুরুত্ব সহকারেই পড়ানো উচিত। তৃতীয়ভাষা হিসাবে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা বা কোনও প্রাচীন ভাষা, অথবা আন্তর্জাতিক কোনও ভাষা-শিক্ষা যে কেউ করতেই পারে। কিন্তু তা স্কুল ছাত্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে না দেওয়াই ভাল। বিশেষত বৃহৎ ভাষিকগোষ্ঠীগত কোনও ভাবাবেগকে ভিত্তি করে কোনও ভাষাকেই অন্য ভাষাভাষীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না। তা ছাড়া এ-ও রাজ্য সরকারের এবং মুখ্যমন্ত্রীর অজানা নয় যে, দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের পর নেপালী ভাষা অন্যতম সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত ভাষা। এই ভাষায় মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক প্রশ্নপত্রও হয়। কলকাতা সহ অনেক জেলা শহরে, শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বহু এলাকায় নেপালী, হিন্দি, উর্দু মাধ্যম স্কুল আছে, অনেক স্কুলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসাবে নেপালী ও হিন্দি ভাষায় পঠন পাঠনও আছে। স্বাভাবিকভাবে একথাও অনস্বীকার্য, যে কেউ তৃতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাও শিখতে পারে— তার সুযোগও থাকার প্রয়োজন আছে। অন্য ভাষাভাষীদের উপর বাংলা ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা অন্য ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। স্পষ্টতই পৃথকতাবাদ সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক শক্তিগুলি তার সুযোগ নিয়ে পৃথকতাবাদী মানসিকতাকে উস্কে দিচ্ছে।

দার্জিলিঙের জনগণকে দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করা হচ্ছে

এটাও বুঝতে হবে, দার্জিলিঙের শোষিত বঞ্চিত জনগণের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে এই সুবিধাবাদী নেতৃত্ব পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সাথে দর কষাকষি করে নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও লালসা পূরণই করেছে বারবার। সুভাষ ঘিসিঙ যা করেছেন বিমল গুরঙ্গও তাই করছেন। এরা কেউই পুঁজিপতি- ব্যবসাদার-মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে শোষিত-বঞ্চিত দার্জিলিংবাসীর স্বার্থে কোনও দাবি তুলছে না, আন্দোলন করা তো দূরের কথা। চরম দারিদ্র এবং কোনও কর্মসংস্থান না থাকায় কীভাবে গরিব নেপালীভাষী মানুষ দেশে বিদেশে সামান্য মজুরির কাজের জন্য হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে, সেখানকার মেয়েরা বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে, পর্যটন শিল্পের নামে হোটেলে লালসার শিকার হচ্ছে— এ সব নিয়ে এই নেতাদের এতটুকু মর্মবেদনা নেই। আছে শুধু নিজেদের হীন স্বার্থে দার্জিলিঙের শোষিত জনগণকে দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করার দুরভিসন্ধি।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা দরকার। একদল যে ভাবে গোর্খাল্যান্ড বিরোধিতার নামে 'বাংলা ভাগ হতে দেব না' বলে স্লোগান দিচ্ছে, তা গোর্খাল্যান্ড বা অন্যান্য পৃথকতাবাদী প্রবণতাকে আরও বাড়তেই সাহায্য করবে। দার্জিলিঙের মানুষের প্রকৃত সমস্যা সমাধানে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের মাধ্যমেই এই পৃথকতার প্রবণতাকে মোকাবিলা করা সম্ভব। গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হোক আর না হোক দার্জিলিঙের খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণার উপশম করতে

গেলে পুঁজিবাদী শোষণের অবসানের লক্ষ্যেই এগোতে হবে। আমাদের মতো বহু ধর্ম ও বহু ভাষাভাষী দেশে বৃহৎ ভাষিকগোষ্ঠীর দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোষ্ঠীর উপর আধিপত্য বিস্তার, বৈষম্যমূলক আচরণ, অবহেলা, অবিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনই মুক্তির যথার্থ পথ। আবার শ্রমিক শ্রেণির যে অংশ এই বঞ্চনা, অবিচার, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদি বিপদ থেকে খেটেখাওয়া মানুষকে রক্ষা করার কাজে এগিয়ে আসবেন তাঁদের নিজেদের সমস্ত প্রকার আঞ্চলিকতা, আধিপত্যবাদ, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগত মানসিকতা থেকে মুক্ত হবার সংগ্রামে ব্রতী হতে হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-উপজাতীয় সত্তা নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত দরিদ্র, মধ্যবিত্ত মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পারে একদিকে মানুষের ন্যায্য দাবি আদায় করতে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সমস্ত ধরনের শোষণ জুলুমের অবসান ঘটানোর লড়াইয়ের জমি তৈরি করতে। এই পথেই সকল ভাষাভাষী মানুষের অবাধ উন্নতির রাজপথ খুলে দেওয়া সম্ভব। একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় পরিচালিত সর্বহারা শ্রেণির যথার্থ বিপ্লবী দলের নেতৃত্বেই এটা করা সম্ভব। এ কথা দার্জিলিং সহ সমগ্র দেশবাসীকে বুঝতে হবে।

দার্জিলিঙে পৃথকতাবাদী হিংসাত্মক হাঙ্গামা চলার সময়েই চা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে কোনও জাতিবিদ্বেষ কাজ করতে পারেনি এজন্যই। এই দৃষ্টান্তকেই আরও বিস্তৃত করতে হবে। অন্যদিকে নেপালী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ সহ দার্জিলিংয়ের মানুষের ন্যায্য দাবিগুলির পাশে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীকেই দাঁড়াতে হবে। এই পথেই স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্ত ও বিচ্ছিন্নতার প্রবণতাকে মোকাবিলা করা সম্ভব।